দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-৩৬

খন্দকার জাহিদ হাসান

বিভ্রান্ত অর্ধ-সুন্দরী

[টাইম মেশিন প্রজেক্টের মূল স্থাপনা ও গবেষণাকেন্দ্রটি অবস্থিত ছিল আরিচা ও বাঘুলির মাঝামাঝি এক অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি স্থানে। সেখান থেকে উড্ডয়নের পর 'হ্যাকিন্টক' নামের যানবাহনটি সোজা উড়ে চলেছিল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার দিকে। চালকের আসনে ছিল একবিংশ শতাব্দীর আধুনিকা অর্ধ-সুন্দরী তরুণী তৃষা চৌধুরী, আর তার পাশের আসনে বসে ছিল একমাত্র আরোহী চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বের বরফ যুগের যুবক কানা জোমন। চুপচাপ অস্বস্তিকর অবস্থার অবসানকল্পে তৃষা মুখ খুল্‌ল। তা ছাড়া সেই মুহূর্তে কানা জোমনের উদ্দেশ্যে অনেক কথাই তাকে বলতে হবে। কারণ এই যুবকটিকে একুশ শতকের উপযোগী করে তোলার দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করা হয়েছে।]

তৃষাঃ কানা, এই হল আমাদের বাংলাদেশ। আমরা এখন এই দেশটির গ্রামগঞ্জ, ক্ষেতখামার আর নদীনালার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি।

কানাঃ ম্যাডাম, বাংলাদেশের প্রকৃতি খুব সুন্দর। চারদিক কী সবুজ!

তৃষাঃ (এক মুহূর্তের জন্য কানা জোমনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে) তোমার তা-ই মনে হচ্ছে? তা তো মনে হবেই। তুমি থাকতে বরফ যুগে। গাছপালা তো জীবনে তেমনটি দেখনি। (ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে) তবুও তোমাকে জানাই, সবুজের আর কি দেখছ এখন? এক সময় এই দেশ আরো অনেক বেশী সবুজ ছিল।

কানাঃ তাই নাকি? তো সবুজ কমে যাওয়ার কারণটা কি ম্যাডাম?

তৃষাঃ কারণ এখন এই দেশের মানুষের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, তারা সমানে গাছপালা কেটে তাদের বসবাসের জন্য বাড়ীঘর তৈরী করে চলেছে। আবাদী ক্ষেতের জমিও ওদের কবল থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

কানাঃ মানুষ বাড়ছে কেন ম্যাডাম?

তৃষাঃ মহামারীর কথা শুনেছ কি? এক সময় এদেশে মহামারীতে অনেক মানুষ মারা যেত। এখন মহামারী নেই।

কানাঃ শুধু এই কারণেই মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে?

তৃষাঃ না, আরো অনেক কারণ আছে। সব তোমার জানার দরকার নেই। তোমাকে সব ব্যাপারেই অল্প অল্প করে ধারণা দেব, যেগুলো তোমার জানা বেশী দরকার। যা হোক, একটু পরে আমরা রাজধানী ঢাকাতে পৌঁছাব। সেখানে তেমন সবুজ নেই। তাই এখন ভাল করে 'সবুজ' দেখে নাও।

কানাঃ কেন, ওখানে কি গাছপালা নেই ম্যাডাম?

তৃষাঃ খুব কম। চারিদিকে শুধু দালানকোঠা, বস্তি, যানবাহন আর মানুষ।

[ওরা এক সময় সাভারে পৌঁছে গেল। তৃষা ইতিমধ্যে হ্যাকিন্টককে মাটি থেকে তিনশ' মিটার উচ্চতায় উঠিয়ে এনেছিল। কানা জোমন খুব-ই আশ্চর্য হয়ে শহীদ স্মৃতিসৌধের বিশাল কাঠামোটির পানে তাকিয়ে ছিল। বক্তৃতা দিতে তৃষার কখনোই ভাল লাগে না। ও কাজটি তাদের টীম লীডার ডঃ আল্‌ফাজ হোসেন খুব ভাল পারেন। তবু কানা জোমনের উদ্দেশ্যে সাভার স্মৃতিসৌধ সম্বন্ধে তৃষা এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ফেল্‌ল।

সব শোনার পর লোকটা তৃষাকে প্রথম যে প্রশ্নটা করল, তাতে রীতিমত বিরক্তই হল তৃষা।]

কানাঃ আচ্ছা ম্যাডাম, ঐ অতবড় জিনিসটা মানুষ কিভাবে বানিয়েছে?

তৃষাঃ এই প্রশ্নটাই সবার আগে তোমার মনে উঁকি দিল! স্মৃতিসৌধের মহান দিকটা দেখতেই পেলে না— এর আকারটাই বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল তোমার কাছে? এতক্ষণ অযথাই তোমার সামনে বক্তৃতা দিলাম।

কানাঃ (লজ্জিত কণ্ঠে) না, মানে, আমি আদিম যুগের আদিম এক মানুষ ম্যাডাম। মহান ব্যাপার-স্যাপার আমার মাথায় তেমন ঢোকে না।

তৃষাঃ (শ্লেষাত্মক কণ্ঠে) তাই নাকি! তুমি নাকি বিরাট একজন মৃৎশিল্পী! আর এই সামান্য মহান ব্যাপারগুলো তোমার মাথায় ঢুকছে না?

কানাঃ মহান ব্যাপার আবার সামান্য হয় কি করে ম্যাডাম?

তৃষাঃ জনাব কানা জোমন, আমি এখনও তোমাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। একবার মনে হয়, তুমি বেশ জ্ঞানী ও চালাক-চতুর। পরক্ষণেই আবার মনে হয়, না, তুমি আসলে বেকুব গোছের একজন মানুষ।

কানাঃ ইয়ে, এই সৌধের বিরাট আকারটা আসলেই আমাকে অবাক করেছে। আমাদের সময়ে এ-রকম একটা জিনিস বানানোর কথা কল্পনাই করা যায় না। তা-ই জানতে চেয়েছিলাম আর কি!

তৃষাঃ দেখ, এটা তোমাদের সেই বরফ যুগ নয়। তোমাদের সময় মানুষ বেশীর ভাগ কাজই একা একা করত। এখন উন্নত আধুনিক যুগ। এ-যুগে মানুষ মিলেমিশে অনেক বড় বড় কাজ করে ফেলতে পারে। তা ছাড়া এখনকার মানুষের হাতে অনেক উন্নত সব সাজসরঞ্জাম রয়েছে, হাতিয়ার রয়েছে, কারিগরি জ্ঞান রয়েছে। আস্তে আস্তে সব-ই দেখতে পাবে। বুঝেছ?

কানাঃ জ্বী ম্যাডাম। কিন্তু সে সুযোগ কি আর আমাদের সবার হবে? তার আগেই যে যার সময়ে ফিরেও তো যেতে পারি।

[কানা জোমনের কথা বলার ভঙ্গীর মধ্যে এক ধরণের দৃঢ়তা ছিল, স্পষ্টতা ছিল। তবে আবার এটাকে কোনোভাবেই 'বেয়াদবী' আখ্যা দেওয়া যায় না। তাই তৃষা রাগ করার কোনো সুযোগ পেল না, যদিও সে সেই সুযোগটাই মনে মনে খুঁজছিল।

অতীতের বিভিন্ন যুগ থেকে ধরে নিয়ে আসা এই মানুষদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না— এটা তৃষা ও অন্যান্য প্রশিক্ষকদেরকে অনেকবার করেই বলে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া এদের সাথে প্রশিক্ষকদের যাবতীয় বাক্যালাপের রেকর্ড অবিকৃতভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে আপনাপনি পৌঁছে যাবে— এই কথাগুলো সবই জানা আছে তৃষার। তবু কিভাবে যেন বার বারই তৃষা তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল। সম্ভবতঃ সে এই কাজের উপযুক্ত নয়। ভার্সিটির লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকাটাই তার জন্য উত্তম ছিল। টাকার লোভে এই ভুল কাজে ঢোকা তার জন্য ঠিক হয়নি। এখন অবশ্য আর সে জন্য পস্তিয়ে কোনো লাভ নেই। তবে একটা ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীনতা ছিল প্রশিক্ষকদেরঃ তাদের নিজ নিজ প্রশিক্ষার্থীদের কবে কোথায় নিয়ে যেতে হবে, কার সাথে পরিচয় করাতে হবে, কোন্ জিনিস সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা দিতে হবে— কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তার কোনো ধরা-বাঁধা ছক ছিল না, প্রশিক্ষকরা নিজেরাই এ-সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারত।

যাই হোক, নিজেকে সামলে নিল তৃষা চৌধুরী। কানা জোমনের কথার খেই ধরে মন্তব্য করল সে।]

তৃষাঃ হ্যাঁ, যার যার সময়ে ফিরে তো যেতেই পার। সে স্বাধীনতা অবশ্যই তোমাদের রয়েছে। কিন্তু তার আগে চোখ-কান খুলে নতুন নতুন জিনিস শিখে নিলে ভাল হয় না কি? নিজেদের সময়ে ফিরে যাওয়ার পর এই অভিজ্ঞতাগুলো কাজেও তো লেগে যেতে পারে।

কানাঃ জ্বী ম্যাডাম, আপনি ঠিক-ই বলেছেন। তা এরপর আমরা কি দেখতে যাচ্ছি?

তৃষাঃ বললাম তো ঢাকা শহর। আর 'আমরা' নয়, বল 'আমি'। আমি নিজে ঢাকা শহরেই বড় হয়েছি। এই শহর আমার কাছে নতুন কিছু নয়। বুঝেছ?

কানাঃ জ্বী বুঝেছি।

তৃষাঃ আরেকটা কথা। ফেলে আসা ঐ স্মৃতিসৌধের চেয়ে আরও বড় বড় সব ইমারত এখন তুমি ঢাকায় দেখতে পাবে।

[হ্যাকিন্টক শিগ্রী ঢাকার আকাশে আবির্ভূত হল। ওরা তখন মাটি থেকে আধ কিলোমিটার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছিল। বরফ যুগের প্রাচীন মানুষ কানা জোমন নীচে তাকিয়ে ছিল। তৃষা ধারা-বিবরণী দিতে আরম্ভ করল।]

তৃষাঃ এই হল ঢাকা শহর। নীচের ঐ দালানকোঠার কথাই তখন তোমাকে বলছিলাম।

কানাঃ ওগুলোর ভেতর কি মানুষ বাস করে ম্যাডাম?

তৃষাঃ (হাসি চেপে) তবে কি ভূত বাস করে!

কানাঃ না, বলছিলাম কি, ওগুলো তো সব একেকটা বদ্ধ খাঁচা। মুক্ত মানুষ ওগুলোতে থাকে কি করে! ও-সবের মধ্যে একমাত্র বন্দীদেরই থাকা সম্ভব।

তৃষাঃ কি যা-তা বকছ কানা! বদ্ধ হবে কেন? ওগুলোর জানালা-দরজা রয়েছে তো।

কানাঃ তাতে কি হয়েছে? তবু তো ওগুলো একেকটা খাঁচাই।

তৃষাঃ 'খাঁচা'!? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কানা?

কানাঃ আমার যা মনে হল, সেটাই বললাম ম্যাডাম। আপনি কি কষ্ট পেলেন?

তৃষাঃ (তাচ্ছিল্যের মেকি হাসি হেসে) কষ্ট পাব কেন? পাগল কোথাকার!

কানাঃ না, মানে, আপনি নিজেও তো এ-ধরণের একটা খাঁচাতেই বড় হয়েছেন। তাই আমার কথায় আপনার কষ্ট পাওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

তৃষাঃ (গলার স্বরে কপট গাম্ভীর্য এনে) চুপ করো! তুমি খুব বেশী কথা বলছ কানা জোমন!! মানুষের থাকার জায়গাকে 'খাঁচা' বলা কি ঠিক? তা হলে তোমরাও তো খাঁচাতেই থাকতে।

কানাঃ জ্বী না ম্যাডাম। আমাদের থাকার জায়গাগুলো ছিল একেবারে মাটির কাছাকাছি– প্রকৃতির কোল ঘেঁষে। আমরা সবাই ছিলাম পাখীর মতো মুক্ত।

[তৃষা চৌধুরী কিছুটা উদাস হয়ে পড়ল। সে মোটামুটিভাবে নিশ্চিত যে, কানা জোমন নামের এই মানুষটার পেছনে খামোখাই সময় নষ্ট করা হচ্ছে– সে নিঃসন্দেহে তার নিজের সময়ে ফিরে যেতে চাইবে। তৃষা এটাও টের পেল যে, তাদের দু'জনার মধ্যেকার সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করেছে। কিন্তু কেন যেন তাতে সে মোটেও খুশী হতে পারল না। মনে হয় বরফটা না গললেই ভাল হত। তবে সে পরিষ্কার বুঝে গেল যে, ডক্টর আলফাজ হোসেন মিথ্যে বলেননি। কানা জোমন লোকটা আসলেই মেধাবী। বরফ যুগের নিরীখে লোকটার ব্যক্তিত্ব একটু বেশীই। কে জানে টাইম মেশিন প্রজেক্টের কর্মীরা ভুল কোনো যুগ থেকে কানাকে ধরে এনেছে কিনা! কিছুই বলা যায় না। লোকটা নিজে তেমন চুপচাপ ধরণের না হলেও ওর মেধার প্রকাশটা আবার বেশ নীরব ধরণের। হ্যাকিন্টক মতিঝিলের দিকে এগিয়ে গেল। কানা একটা দূরবীণ চোখে লাগিয়ে সবকিছু প্রত্যক্ষ করছিল। আবার তৃষার 'কমেন্ট্রি' শুরু হল।]

তৃষাঃ এখন আমরা উড়ে চলেছি রাজধানীর ব্যস্ততম এলাকা মতিঝিলের ওপর দিয়ে। এটা একটা বাণিজ্যিক এলাকা। আমাদের সভ্যতারও প্রতীক। অনেক অফিস-আদালত আর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রয়েছে এখানে। দেখ, এখানে কতো সুন্দর সুন্দর সব উঁচু উঁচু ইমারত তৈরী করা হয়েছে– যেখানে বসে দেশ-বিদেশের বড় বড় মানুষেরা নানা ধরনের কাজকর্ম করতে পারে। আর দেখেছ, প্রশস্ত সব রাজপথ দিয়ে কতো গাড়ী আর অসংখ্য মানুষ ছোটাছুটি করছে!

কানাঃ যা-ই বলেন না কেন ম্যাডাম, চারিদিকে যতোই ঝকমকে সব জিনিস আপনারা তৈরী করে থাকেন না কেন, আমার কেন যেন মনে হয়, 'শান্তি' নামের ব্যাপারটা খুব একটা নেই আপনাদের এই রাজধানীতে।

তৃষাঃ (সব গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলে স্বভাবসুলভ মেয়েলী ধাঁচে) ওরে আমার কি বিরাট দার্শনিক রে! তোমার খালি বড় বড় কথা! (পরক্ষণেই নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে) কানা, একটা কথা মনে রেখো, এ-যাবতকালের সকল মানবসভ্যতার বিচারে বর্তমানকালই হচ্ছে বিশ্ব-সভ্যতার সর্বোচ্চ চূড়া। পশ্চিমা বিশ্বে গেলে আরও বেশী করে এই সত্যের সন্ধানটা তুমি পেতে। আমাদের সভ্যতাকে তুমি ক্রমাগতভাবে খাটো করে দেখে যেতে পারো না কানা।

কানাঃ ম্যাডাম, আপনি কঠিন ভাষায় কথা বলছেন। সব কথার মানে আমি ধরতে পারছি না। কিন্তু 'চূড়া' শব্দটা আমার পরিচিত। আপনারা যে এ-যুগে চূড়ার ওপর এসে পৌঁছেছেন– সে ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন কিভাবে?

[অর্ধ-সুন্দরী তৃষা চৌধুরী মনে মনে টলে উঠল। কিছুদিন আগে সে বাম রাজনীতির প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। প্রচুর বইপত্রও পড়েছিল সেই সুবাদে। তা ছাড়া সবকিছু বেশ ওপর থেকে দেখার একটা প্রবণতা তার বরাবর-ই ছিল। কানা জোমন ডান-বামের কিছুই বোঝে না, বোঝার কথাও নয় তার– তৃষা তা জানত। অথচ বিভিন্ন ব্যাপারে কানার নিরুত্তাপ ধরণের মন্তব্যগুলো, বিশেষ করে 'খাঁচা', 'বন্দী'– এই শব্দগুলো যেন তাকে শেলের মতো বিঁধে যাচ্ছিল। হ্যাকিন্টকের টেলি-ইনফর্মেশন চ্যানেলে আনমনে তৃষা 'আজকের অনুষ্ঠানসূচী' দেখছিল। হঠাৎ তার মনোযোগ কাড়ল একটা ছোট্ট ঘোষণাঃ সকাল দশটায় জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারের নর্তকী ফারিদার একক নৃত্যানুষ্ঠান। আচম্বিতে তৃষার মনোজগতে এক প্রকারের ভূমিকম্পের আবির্ভাব হল। চোখের সামনে থেকে একটা অদৃশ্য পর্দা যেন সরে গেল। কি এক অজানা মন্ত্রে সে যেন উজ্জীবিত হয়ে উঠল। সাঁই করে হ্যাকিন্টক ঘুরিয়ে শাহাবাগের দিকে ছুটল তৃষা। সেই সাথে তার মুখ হতে কথার ফুলঝুরি ছোটাতে আরম্ভ করল।]

তৃষাঃ কানা, চলো আমরা এখন এক সুন্দরী মেয়ের নাচ দেখতে যাই। তুমি ওকে চেনো। ওর নাম ফারিদা। সে ছিল আজ থেকে চার শ' বছর আগের দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারের নাচিয়ে। মেয়েটা দেখতে যেমন সুন্দর, তার নাচও তেমনি অপূর্ব! আমি ওর নাচের ভিডিও দেখেছি। এবার সামনাসামনি দেখা যাক।... তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কানা?

কানাঃ জ্বী ম্যাডাম, পাচ্ছি।

তৃষাঃ তা হলে কথা বলছ না কেন?

কানাঃ কি বলব!

তৃষাঃ ফারিদার কথা? তোমার সাথে ওর পরিচয় হয়নি?

কানাঃ জ্বী না, আমার সাথে তার ওভাবে পরিচয় হয়নি। তবে আমি তাকে চিনি। ভাষা শিক্ষা ক্লাসে ও আমার সহপাঠি ছিল।

তৃষাঃ সেটা আমি জানি। আচ্ছা, শুনেছি বাংলা ভাষার ছাত্রী হিসাবে সে নাকি তেমন ভাল ছিল না?

কানাঃ হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন ম্যাডাম। ভাষা শিক্ষক প্রায়ই তার ওপর বিরক্ত হতেন, আর তাকে বলতেন, ‘‘ফারিদা, তোমার মাতৃভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার তো কিছুটা মিল রয়েছে, তাহলে তুমি এত খারাপ করছ কেন?’’

তৃষাঃ আমি তোমার কাছে এত কথা জানতে চাইছি না।... আর এটাও আমার মাথায় ঢোকে না যে, ফারিদাকে বাংলা শেখানোর দরকারটা কি! ও তো চোস্ত্ হিন্দি জানে।

কানাঃ আপনি ওকে খুব পছন্দ করেন, তাই না?

তৃষাঃ অবশ্যই করি। এত সুন্দর একটা মেয়ে, আর কি গুণী নাচিয়ে!

কানাঃ জ্বী, ফারিদা খুব সুন্দর। তবে ওর সৌন্দর্যের মাঝে বেশ কিছু ত্রুটি রয়েছে।

তৃষাঃ (ঝট্ করে কানার দিকে ফিরে) তার মানে?

কানাঃ দুঃখিত ম্যাডাম, আপনাকে তার ব্যাখ্যা দেওয়া একটু শক্ত হবে। ওর সৌন্দর্যের সাথে বুদ্ধিমত্তার ঠিকমতো মিশেল ঘটেনি। মেয়েটার চেহারায় বন্দিত্বের একটা স্থায়ী ছাপও রয়েছে।

তৃষাঃ বাব্বা, এত কিছু তোমার নজরে এসেছে!

কানাঃ আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি ম্যাডাম, আমি অসংখ্য নারীমূর্ত্তি গড়েছি। পুরুষের মূর্ত্তিও গড়েছি। মানুষের চেহারার এই সব বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দেওয়াই আমার পেশার বিরাট একটা অংশ।

তৃষাঃ তুমি যেমনটি ভাবছ, ঠিক সে-রকমভাবে সম্রাটরা ফারিদাদের বন্দী করে রাখত না। রাজসভার নর্তকী আর অন্যান্য শিল্পীদের উপযুক্ত পারিশ্রমিকও দেওয়া হত।

কানা আমি তেমন কিছুই ভাবছি না ম্যাডাম। আর এ-সব কথা আমি কি করে জানব, বলুন? আমি যা দেখেছি, সেটাই বলছি।

তৃষাঃ না, তুমি একদম ভুলও বলছ না। মুঘল আমলে ফারিদা এক ধরণের বন্দীজীবনই কাটিয়েছে। সে তখন ছিল পুরুষের ভোগের সামগ্রী। (কিছুটা অসহিষ্ণু কণ্ঠে) কিন্তু এখন একুশ শতক। এই শতকের এই উজ্জ্বল পূর্বাহ্নে আমরা এখন ফারিদাকে মুক্তি দিতে যাচ্ছি!

কানাঃ তাতে তেমন কোনো লাভ হবে না ম্যাডাম। কারণ বন্দীত্বের প্রভাব কেবলমাত্র তার চেহারায় ছাপ ফেলেনি, ওর মগজের গভীরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

তৃষাঃ কানা, আমি আসলেই বিভ্রান্ত। তুমি কি সত্যিই বরফ যুগের এক আদিম মানুষ? তোমাদের কালে তো মানুষের চেহারার সৌন্দর্য নিয়ে এত উন্নত ধরণের চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ ঘটার কথা নয়! আর সে যুগে তো মানুষের চেহারার তেমন কোনো সুকুমার বিকাশও ঘটে থাকার কথা নয়!!

[কানা জোমন কোনো উত্তর দিল না। হ্যাকিন্টক ভেসে চলল জাদুঘর মিলনায়তনের দিকে।]

(কল্পকাহিনীঃ চলবে...)

লেখক খঃ জাহিদ হাসানের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকামারুন